খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

লালন সাঁই

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি
দিতাম পাখির পায়।।

আট কুঠুরী নয়
দরজা আটা মধ্যে মধ্যে
ঝরকা কাঁটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।।

কপালের ফের নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙ্গে পাখিয়ামার
কোন খানে পালায়।।

মন তুই রইলি খাঁচার আসে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশের
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়.....
এখানে খাঁচা বলতে দেহ/শরীরকে বোঝানো হয়েছে,
আর পাখি বলতে স্বাস-প্রশ্বাস।

লালন শাহ

লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০) বাউল সাধনার প্রধান গুরু, বাউল গানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা, গায়ক। ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (১৭৭২) ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। মতান্তরে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর ভাঁড়রা গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রণ করেন। এ তথ্যটি পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর দুসপ্তাহ পরে হিতকরী (১৮৯০) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ-নিবন্ধে।

কথিত আছে, লালন শাহ যৌবনকালে একবার তীর্থভ্রমণে বের হয়ে পথিমধ্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন সঙ্গীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। এমতাবস্থায় সিরাজ সাঁই নামে একজন মুসলমান ফকির তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করে তোলেন। পরে লালন তাঁর নিকট বাউলধর্মে দীক্ষিত হন এবং ছেউড়িয়াতে একটি আখড়া নির্মাণ করে স্ত্রী ও শিষ্যসহ বসবাস করেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। তাঁর শিষ্যের সংখ্যা ছিল অনেক।

লালনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, কিন্তু নিজ সাধনাবলে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর রচিত গানে সেই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তিনি প্রায় দুহাজার গান রচনা করেন। তাঁর গান মরমি ব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সহজ-সরল শব্দময় অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী তাঁর গানে মানব জীবনের আদর্শ, মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

লালন কোনো জাতিভেদ মানতেন না। তাই তিনি গেয়েছেন: 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/ লালন কয় জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।' এরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে সিক্ত বলে লালনের গান বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান জনপ্রিয়। তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশী নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে' ইত্যাদি গান বাউল তত্ত্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

লালনের গান এক সময় এতই জনপ্রিয় ছিল যে, তা সাধারণ মানুষ ও নৌকার মাঝি-মালাদের মুখে মুখে শুনা যেত। এমনকি বর্তমানেও সকল মহলে এ গানের কদর বাড়ছে এবং রেডিও-টেলিভিশনে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। বহু তীর্থভ্রমণ এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভের পর ছেউড়িয়ার আখড়ায় বসেই লালন আজীবন সাধনা ও সঙ্গীতচর্চা করেন। লালনের লেখা গানের কোনো পান্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত পরবর্তীকালে শিষ্যদের কেউ সেগুলি সংগ্রহ ও সংকলিত করেন।

কুষ্টিয়ার কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-৯৬) এবং মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) লালন শাহ ও তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হরিনাথ তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ছেউড়িয়া থেকে ছয় মাইল দূরে শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ লালন শাহর ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেন এবং সেগুলি থেকে ২০টি গান তিনি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি মানবধর্ম (Religion of Man) বিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তৃতায়ও লালনের গানের উল্লেখ করেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর, ১৮৯০)

ছেউড়িয়ায় লালন পরলোক গমন করেন। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমা (মার্চ-এপ্রিল) ও মৃত্যু বার্ষিকীতে ভক্তবৃন্দ তাঁর মাযারে সমবেত হন এবং তিন দিন ধরে সাধুসেবা ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রসিদ্ধ লালন গীতি "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়..." গানটির গূঢ় অর্থ কী?

বাউল দর্শনের দেহতত্ত্ব নিয়েই মূলত গানটা রচিত। অনেক বিস্তৃত জিনিস। আমি সহজ ভাষায় এ গানটিতে থাকা বাউলদের সিক্রেট কোডগুলোকে একে একে ডেক্রিপ্ট করছি। সহজ করার জন্য ব্যাপারগুলো বিস্তৃত হয়ে যাবে। বিস্তৃত হলেও একটু সময় নিয়ে পড়লে জীবনের গভীর ও অন্যরকম দর্শন লাভ করতে পারবেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বাউল দর্শনে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর কাজগুলো সহ আরো অনেক গানকে বুঝতে পারবেন।

খাঁচা বলতে আমাদের ফিজিক্যাল মানবদেহ কে বোঝানো হয়েছে। খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, পাখিটা কি তা প্রথমেই খোলাশা করবো না। ব্যাপারটা একটু গভীর তাই আগে মাঝখানের কিছু অংশ বুঝে নিই। এতে পাখির যাওয়া আসার ব্যাপারটি ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে।

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা

কবির প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত খাঁচার আট কুঠুরি হল মানবদেহের মাথার খুলি, ডান-বাম দুই ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, দুই কিডনি আর কোলন। এদের সাথে নয়টি দরজা যুক্ত।

নয় দরজা মানুবদেহ নামক এ খাঁচার বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট এর জায়গা - দুই চোখ, দুই নাকের ফুটো, মুখ, দুই কানের ফুটো, আর বাকি দুইটা জননাঙ্গ ও পায়ু।

কালবের রন্ধ্রসমূহ হলো ঝরকা

“তার উপরে সদর কোঠা আয়নামহল তায়”

এটুকু কথায় লুকিয়ে আছে এক বিস্তৃত অর্থ।

সদর কোঠা মানবদেহের চেতনার সর্বোচ্চ পর্যায় যার অবস্থান মাথার মস্তিষ্কের ওপরে ধরা হয়। যেহেতু বিজ্ঞান প্রকৃতির ব্যাপারগুলোকে হাতেকলমে প্রমাণ করে একে আমরা ভরসা করি। বৈজ্ঞানিকভাবে একটু আলোচনা করি। এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে চারপাশে যা দেখছি তা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কিছু তরঙ্গমাত্র। ভিজিবল লাইট বলা হয়। এছাড়াও আছে রেডিও ওয়েভ তরঙ্গ, রঞ্জক রশ্মি বা এক্স রে, ইনফ্রারেড আছে, আমরা ব্যবহারও করছি। সেগুলোও তরঙ্গই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আলোর মত। কারণ আমাদের চোখের সেগুলো দেখার সক্ষমতা নেই। কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই ক্যাচ করতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে আমরা তরঙ্গগুলো বিভিন্ন সিগনালে রূপান্তর করে আলো, রঙ, শব্দ এগুলোতে পরিণত করে নিচ্ছি। বোঝাই যাচ্ছে 'রিয়েলিটি' এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত। আমরা ব্যবহারই করছি এতে অস্বীকারের কোন উপায় নাই। আমরা যা দেখি এটাকে আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভেবে দেখুন আপনি আয়নায় যখন নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন

সেই প্রতিবিম্বের কোন দাম আছে? জাস্ট ইল্যুশন। তার ভিতরে না আছে জীবন না সে কিছু করতে পারবে। কিন্তু আয়নার বাইরে আমরা যে আছি এটা আমাদের আপাতদৃষ্টিতে সত্যিকার রিয়েলিটি। বা আমাদের আয়নামহল বলা যায়। কিন্তু আমরা যেটাকে রিয়েলিটি ভাবছি এর উপরেও আরো রিয়েলিটি লেভেল আছে আমাদের যিনি হায়ার সেল্ফ বা আত্মা তিনি তা অবলোকন করছেন। তাঁর অবলোকনটাই এখানে আয়নামহল বলা হচ্ছে। আর সেই আয়নামহলের শুধু একটা প্রতিবিম্ব হলো আমাদের দেখা আলো, রঙ, শোনা শব্দ এসব। ইল্যুশন। এই আয়নামহল টা যারা অনেক সাধনা করে নিজ আত্মাকে অনুভব করতে পেরেছে তারাই দেখেছে। এছাড়া বাকিরা পারছি না এ ব্যাপারেও গানটিতে বলা আছে। তা একটু পরে বলছি। এ আয়নামহলকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়ে থাকে অবেচেতন/অর্ধচেতন মন বা Subconscious Mind.

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় এ পার্টটা যে বাকি রেখেছিলাম তা এবার ডেক্রিপ্ট করি।

এখানের পাখিটাই হচ্ছে আমাদের আত্মা। বাউল দর্শন অনুযায়ী প্রতিটা দমের সাথে আত্মাটা দেহে প্রবেশ করছে, দমটা ছাড়ার সাথে সাথে আবার চলে যাচ্ছে। দমটা ছেড়ে দেয়ার পর আর প্রবেশ করে না করলেই আপনি মৃত। এর কারণ হলো আত্মাটা আর প্রবেশ করছে না। এখন কবি বলছেন খাঁচায় অর্থাৎ দেহে এই অচিন পাখি অর্থাৎ তাঁর আত্মা আসছে আবার যাচ্ছে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে। কীভাবে এ আসা যাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে এ এক রহস্য। যদি তিনি ধরতে পারতেন, মনবেড়ি দিতেন পাখির পায়ে যেন আর যেতে না পারে।

কপালের ফের নইলে কি আর পাখিটির এমন ব্যবহার

খাঁচা ছেড়ে পাখি আমার কোনখানে পালায়?

অনেক সৎকর্মশীল সাধক তাঁর আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে কিছু সময়ের জন্য। আমরা মানুষ তা পারছি না। পারলেও আবার পালিয়ে যাচ্ছে। একে কবি তাঁর কপালের ফের বলছেন। আত্মা বার বার কোথায় পালাচ্ছে তাঁকে ছেড়ে? আফসোস আর তীব্র আকাঙ্ক্ষরই প্রকাশ করছেন লাইন দুইটি দিয়ে।

মন তুই রইলি খাঁচার আশে, খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশের

কোনদিন খাঁচা পরবে খসে লালন ফকির কয়

এখানে আমাদের প্রবৃত্তি, অবুঝ মনের কথা বলা হচ্ছে। সাধকের আত্মার দর্শন বা নিজ দর্শন পেতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ ইল্যুশন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয়। কিন্তু মন আমাদের এই ইল্যুশনে বেঁধে রাখে। সে চিন্তা করে তাঁর খাঁচা বা মানবদেহটির কথা। দেহের কীভাবে

তৃপ্তি হয় তা-ই ভাবাতে সর্বদা চিন্তা আনতেই থাকে আমাদের মাথায়। খাবার, সেক্স। হ্যাঁ পৃথিবীতে এই দেহের সার্ভাইভালের জন্য দরকার আছে এ জন্যেই এগুলো দেহের মাঝে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দরকারটা খুবই সীমিত। কিছু দরকার অপ্রয়োজনীয়। আমরা নিজেদের এতে এমনভাবে ডুবিয়ে ফেলি যে এতেই ডুবে থাকছি শুধু। পৃথিবীটাও সেভাবেই ফর্ম করা হয়েছে। যাই হোক মন দেহের আশায় থাকছে, ডুবিয়ে রাখছে, আত্মদর্শন করতে দিচ্ছে না। এই দেহ নিয়ে কত গর্ব, অহংকার। কিন্তু দেহটাতো কাঁচা বাঁশ বা হাঁড় দিয়ে গঠিত। যা কোনদিন খসে পরে এর কোন ঠিক নেই। তা-ই লালন ফকির বলছেন।

মনের মানুষ

কুষ্টিয়া অঞ্চলের একটি কায়স্থ (হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি উপর্বণ বিশেষ) পরিবারে জন্ম নেয় লালু নামরে একটি ছেলে। শৈশব কালেই বাবাকে হারিয়ে মায়ের আঁচলে বড়ো হতে থাকে সে। প্রায় কিশোর বয়সেই করতে হয় বিয়ে। কাজে কর্মে কোনো মন নেই। গানকে সে অনেক ভালোবাসে। একদিন গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে একটি দলের সঙ্গে বহরমপুরে যাত্রা করে লালু। পথিমধ্যে বসন্ত রোগের কবলে পড়তে হয় তাকে। সঙ্গী-সাথীরা তাকে মৃত ঘোষণা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দয়ে। তবে ভাগ্যের চরম লীলাখেলায় লালু প্রাণ ফিরে পায় এক মুসলমান মায়ের সেবায়। এমন সময় তার সাথে পরিচয় হয় সিরাজ সাঁই নামক এক সাধকরে সাথে। সুস্থ হয়ে যখন লালু তার আপন গৃহে ফিরে যায় তখন তাকে শুনতে হয় ধর্মচ্যুত হওয়ার অপবাদ। নিজের গর্ভধারিনী মাও যখন এই অপবাদে তাকে ছিটকে দিয়ে ঘরে ঠাই না দিলে রাগে অভিমানে লালু চিরদিনের জন্যে গৃহত্যাগ করে। গৃহত্যাগের পরে লালু এক জঙ্গলে নিজের আবাসস্থল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজের অতীতের সবকিছু মাটি চাপা দিয়ে লালু থেকে লালন নামে তার নিজের জীবন শুরু করে।

এরকম একটি প্রেক্ষাপট দিয়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'মনের মানুষ' উপন্যাসটি রচনা করছেনে। উপন্যাসটিতে তিনি লালনের জীবনের মূলভাব ও আর্দশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেনে। লালন সবসময় প্রচার বিমুখ থাকায় তার সঠিক জন্ম ইতিহাস কিংবা তার জীবদ্দশার তথ্যাবলি তেমন একটা পাওয়া যায় না। তবে তার বিভিন্ন গান যেমন 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে? লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে" কিংবা "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়?' অথবা 'মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে" ইত্যাদি গানগুলোতে তার জীবনদর্শন অনেকটাই উপলব্ধি করা যায়।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মূলত তিনিই আধুনিক সমাজের সাথে লালনের গানের পরিচয় করিয়ে দেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে লালনের কখনও প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয় হয়ছেে বলে কোনো প্রমাণ গবষেণায় পাওয়া যায়নি।

উপন্যাসের শেষে লেখক 'লেখকের বক্তব্য' নামক অংশে এই উপন্যাসটির ব্যাপারে কিছু গুরুত্বর্পূণ কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অকপটেই বলছেনে এটি লালনের কোনো জীবনকাহিনী নয়। লোকশ্রুতি অনুযায়ী এবং কিছু লালন গবষেণামূলক বইয়ের উপর নির্ভর করে কাল্পনিক এবং বাস্তবিক কিছু চরিত্র নিয়ে তিনি তার এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। সেখানে তিনি লালন গবষেক আবুল আহসান চৌধুরী এবং সৈয়দ শহীদ নামক জৈনক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেনে। পাঠকদের তৃষ্ণা মেটাতে লেখক বইয়ের শেষে লালনের বেশ কিছু গানও সংযোজন করেন। শুধু তাই নয়, লালনের জীবনর্দশন এবং সমসাময়কি কাল সর্ম্পকে যারা জানতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে লেখক অতি প্রয়োজনীয় কিছু বইয়ের নামও উল্লেখ করেন।

সবশেষে বলব, উপন্যাসটিতে লেখক খুব সহজভাবে লালনের জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। একজন লালনভক্ত হিসেবে আমি তাঁর সর্ম্পকে অনেক কিছুই এই বইয়ের মাধ্যমে

জানতে পেরেছি। বইটি আমাকে লালন ও তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তুলেছে। চাইলে আপনিও পড়ে ফেলতে পারেন এক মহাত্মার জীবনদর্শনের এই দর্পণ।

“খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ” : লালন ফকির
(জন্ম ১৭৭৪- মৃত্যু অক্টোবর ১৭, ১৮৯০)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালী যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন ইত্যাদি নামেও পরিচিত। তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, অসংখ্য অসাধারণ গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। লালনকে বাউল গানের একজন অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার গানের মাধ্যমেই ঊনিশ শতকে বাউল গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাকে ‘বাউল সম্রাট’ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।লালন ছিলেন একজন মানবতাবাদী যিনি ধর্ম, বর্ন, গোত্রসহ সকল প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক এই মনোভাব থেকেই তিনি তার গানসমূহ রচনা করেন। তার গান ও দর্শন যুগে যুগে প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুলের মত বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবিসহ অসংখ্য মানুষকে। তার গানগুলো মূলত বাউল গান হলেও বাউল সম্প্রদায় ছাড়াও যুগে যুগে বহু সঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠে লালনের এই গানসমূহ উচ্চারিত হয়েছে। গান্ধীরও ২৫ বছর আগে, ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম, তাকে ‘মহাত্মা’ উপাধি দেয়া হয়েছিল।

লালনের জীবন সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তার সবচেয়ে অবিকৃত তথ্যসুত্র তার নিজের রচিত অসংখ্য গান। কিন্তু লালনের কোন গানে তার জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য তিনি রেখে যাননি, তবে কয়েকটি গানে তিনি নিজেকে “লালন ফকির” হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পনেরো দিন পর কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, “ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যরা তাহার নিষেধক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।” লালনের জন্ম কোথায় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। লালন নিজে কখনো তা প্রকাশ করেননি। কিছু সূত্রে পাওয়া যায় লালন ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হারিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। কোন কোন লালন গবেষক মনে করেন, লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন। এই মতের সাথেও অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। বাংলা ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে বলে উল্লেখ করা হয়। হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নিবন্ধে বলা হয়েছে , লালন তরুন বয়সে একবার তীর্থভ্রমণে বের হয়ে পথিমধ্যে গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন তার সাথীরা তাকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করে যার যার গন্তব্যে চলে যায়। কালিগঙ্গা নদীতে ভেসে আসা মুমূর্ষু লালনকে উদ্ধার করেন মলম শাহ। মলম শাহ ও তার স্ত্রী মতিজান তাকে বাড়িতে নিয়ে সেবা-শুশ্রষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। এরপর লালন তার কাছে দীক্ষিত হন এবং কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়াতে স্ত্রী ও শিষ্যসহ বসবাস শুরু করেন। গুটিবসন্ত রোগে একটি চোখ হারান লালন। ছেউরিয়াতে তিনি দার্শনিক গায়ক সিরাজ সাঁইয়ের সাক্ষাতে আসেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন। এছাড়া লালন সংসারী ছিলেন

বলে জানা যায়। তার সামান্য কিছু জমি ও ঘরবাড়ি ছিল। লালন অশ্বারোহনে দক্ষ ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে অশ্বারোহনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন.
লালনের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে গবেষকদের মাঝে যথেষ্ঠ মতভেদ রয়েছে, যা তার জীবদ্দশায়ও বিদ্যমান ছিল। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত প্রবাসী পত্রিকার মহাত্মা লালন নিবন্ধে প্রথম লালন জীবনী রচয়িতা বসন্ত কুমার পাল বলেছেন- "সাঁইজি হিন্দু কি মুসলমান, এ কথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম।" বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় লালনের জীবদ্দশায় তাকে কোন ধরনের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতেও দেখা যায় নি। লালনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। নিজ সাধনাবলে তিনি হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম উভয় শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তার রচিত গানে এর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসী পত্রিকার নিবন্ধে বলা হয়, লালনের সকল ধর্মের লোকের সাথেই সুসম্পর্ক ছিল। মুসলমানদের সাথে তার সুসম্পর্কের কারনে অনেকে তাকে মুসলমান বলে মনে করত। আবার বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা করতে দেখে হিন্দুরা তাকে বৈষ্ণব মনে করতো। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন মানবতাবাদী এবং তিনি ধর্ম, জাত, কূল, বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদি অনুসারে মানুষের ভেদাভেদ বিশ্বাস করতেন না।
বাংলা ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম মুসলিম পরিবারে বলে উল্লেখ করা হয়। আবার ভিন্ন তথ্যসূত্রে তার জন্ম হিন্দু পরিবারে বলে উল্লেখ করা হয়।
লালন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ
"লালন ফকির নামে একজন বাউল সাধক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের সমন্বয় করে কী যেন একটা বলতে চেয়েছেন - আমাদের সবারই সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ।"

যদিও তিনি একবার লালন 'ফকির' বলেছেন, এরপরই তাকে আবার 'বাউল' বলেছেন, যেখানে বাউল এবং ফকিরের অর্থ পারস্পরিক সংঘর্ষপ্রবণ।
লালনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে উপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''লালন ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু কোনোও বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন জীবনে।''
লালনের পরিচয় দিতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন,
''কাঙাল হরিনাথ তাঁকে জানতেন, মীর মশাররফ চিনতেন, ঠাকুরদের হাউসবোটে যাতায়াত ছিল, লেখক জলধর সেন বা অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁকে সামনাসামনি দেখেছেন কতবার, গান শুনেছেন, তবু জানতে পারেননি লালনের জাতপরিচয়, বংশধারা বা ধর্ম।"

একটি গানে লালনের প্রশ্নঃ

“এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।। ”

কিছু লালন অনুসারী যেমন মন্টু শাহের মতে, তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোনটিই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন ওহেদানিয়াত নামক একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী। ওহেদানিয়াতের মাঝে বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া মতবাদ, সুফিবাদ সহ আরও অনেক ধর্মীয় মতবাদ বিদ্যমান। লালনের অনেক অনুসারী লালনের গানসমূহকে এই আধ্যাত্মিক মতবাদের কালাম বলে অভিহিত করে থাকে।

লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলার ছেঁউড়িয়াতে একটি আখড়া তৈরি করেন, যেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের নীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। তার শিষ্যরা তাকে “সাঞ” বলে সম্বোধন করতেন। তিনি প্রতি শীতকালে আখড়ায় একটি ভান্ডারা (মহোৎসব) আয়োজন করতেন। যেখানে সহস্রাধিক শিষ্য ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হতেন এবং সেখানে সংগীত ও আলোচনা হত। চট্টগ্রাম, রঙপুর, যশোর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক লালন ফকীরের শিষ্য ছিলেন; শোনা যায় তার শিষ্যের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের বেশি ছিল। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেকের সঙ্গে লালনের পরিচয় ছিল বলে বিভিন্ন সুত্রে জানা যায়। বিরাহিমপুর পরগনায় ঠাকুর পরিবারের জমিদারিতে ছিল তাঁর বসবাস এবং ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা ছিলেন তিনি। ঊনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজে তার প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতার পেছনে ঠাকুর পরিবার বড় ভূমিকা রাখেন।

কিন্তু এই ঠাকুরদের সঙ্গে লালনের একবার সংঘর্ষ ঘটে। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কুষ্টিয়ার কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদার গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এরই একটি সংখ্যায় ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ ও তথ্য প্রকাশের সূত্র ধরে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তারা বিষয়টির তদন্তে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে আসেন। এতে করে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ঠাকুর-জমিদারেরা। তাঁকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে লাঠিয়াল পাঠালে শিষ্যদের নিয়ে লালন সশস্ত্রভাবে জমিদারের লাঠিয়ালদের মোকাবিলা করেন এবং লাঠিয়াল বাহিনী পালিয়ে যায়। এর পর থেকে কাঙাল হরিনাথকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করেছেন লালন।

লালনের জীবদ্দশায় তার একমাত্র স্কেচটি তৈরী করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। লালনের মৃত্যুর বছরখানেক আগে ৫ মে ১৮৮৯ সালে পদ্মায় তাঁর বোটে বসিয়ে তিনি এই পেন্সিল স্কেচটি করেন- যা ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। যদিও অনেকের দাবী এই স্কেচটিতে লালনের আসল চেহারা ফুটে ওঠেনি।

১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর লালন ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব থেতে তিনি পেটের সমস্যা ও হাত পায়ের গ্রন্থির সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। এসময় তিনি মাছ

খেতে চাইতেন। মৃত্যুর দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত তিনি গানবাজনা করেন এবং এক সময় তার শিষ্যদের কে বলেনঃ “আমি চলিলাম” এবং এর কিছু সময় পরই তার মৃত্যু হয়। তার নির্দেশ বা ইচ্ছা না থাকায় তার মৃত্যুর পর হিন্দু বা মুসলমান কোন ধরনের ধর্মীয় রীতি নীতিই পালন করা হয় নি। তারই উপদেশ অনুসারে ছেউড়িয়ায় তার আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তার সমাধি করা হয়। আজও সারা দেশ থেকে বাউলেরা অক্টোবর মাসে ছেউড়িয়ায় মিলিত হয়ে লালনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁর মৃত্যুর ১২ দিন পর তৎকালীন পাক্ষিক পত্রিকা মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত হিতকরীতে প্রকাশিত একটি রচনায় সর্বপ্রথম তাঁকে “মহাত্মা” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রচনার লেখকের নাম রাইচরণ।

লালনের গানে মানুষ ও তার সমাজই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ। তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে মানবতাবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। তার বহু গানে এই মনের মানুষের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন মনের মানুষের কোন ধর্ম, জাত, বর্ন, লিঙ্গ, কূল নেই। মানুষের দৃশ্যমান শরীর এবং অদৃশ্য মনের মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সকল মানুষের মনে ঈশ্বর বাস করেন। লালনের এই দর্শনকে কোন ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্গত করা যায় না। লালন, মানব আত্মাকে বিবেচনা করেছেন রহস্যময়, অজানা এবং অস্পৃশ্য এক সত্ত্বা রূপে। “খাচার ভিতর অচিন পাখি” গানে তিনি মনের অভ্যন্তরের সত্ত্বাকে তুলনা করেছেন এমন এক পাখির সাথে, যা সহজেই খাঁচা রূপী দেহের মাঝে আসা যাওয়া করে কিন্তু তবুও একে বন্দি করে রাখা যায় না।

লালনের সময়কালে যাবতীয় নিপীড়ন, মানুষের প্রতিবাদহীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি-কুসংস্কার, লোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা সেদিনের সমাজ ও সমাজ বিকাশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজের নানান কুসংস্কারকে তিনি তার গানের মাধ্যমে করেছেন প্রশ্নবিদ্ধ। আর সে কারণেই লালনের সেই সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বহু শিষ্ট ভূস্বামী, ঐতিহাসিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবী, লেখক এমনকি গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মানুষও। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তিনি প্রায় দুই হাজার গান রচনা করেছিলেন। তার সহজ-সরল শব্দময় এই গানে মানবজীবনের রহস্য, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। লালনের বেশ কিছু রচনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সম্পর্কে অতীব সংবেদনশীল ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যখন হিন্দু ও মুসলিম মধ্যে জাতিগত বিভেদ-সংঘাত বাড়ছিল তখন লালন ছিলেন এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি মানুষে-মানুষে কোনও ভেদাভেদে বিশ্বাস করতেন না। মানবতাবাদী লালন দর্শনের মূল কথা হচ্ছে মানুষ। আর এই দর্শন প্রচারের জন্য তিনি শিল্পকে বেছে নিয়েছিলেন। লালনকে অনেকে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সাম্প্রদায়িক পরিচয় দিয়ে। কেউ তাকে হিন্দু, কেউ মুসলমান হিসেবে পরিচয় করাবার চেষ্টা করেছেন। লালনের প্রতিটি গানে তিনি নিজেকে ফকির (আরবি “সাধু”) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

(এই রচনাটিতে লালনের যে ছবি দেওয়া হয়েছে, নন্দলাল বসুর আঁকা লালনের এই কাল্পনিক চিত্রই সাধারন মানুষের কাছে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।)

লালন ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানের শুরুতেই আমাদের একটা টেনশনে ফেলে দেন। চিড়িয়াখানায় বন্দী বাঘের টেনশন নয় এটি। এটি একটি মুক্ত হরিণের টেনশন-- যে কিনা তার অজান্তে শিকারির জালে আটকা পড়ে গেছে!

লালন ফকির

১০টি শব্দশ্বাস: খাঁচা, অচিন পাখি, মনবেড়ি, আট কুঠুরি, নয় দরজা, আয়নামহল, মন, আশা, কাঁচা বাঁশ, পাখি পালায়।

লালন ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানের শুরুতেই আমাদের একটা টেনশনে ফেলে দেন। চিড়িয়াখানায় বন্দী বাঘের টেনশন নয় এটি। এটি একটি মুক্ত হরিণের টেনশন-- যে কিনা তার অজান্তে শিকারির জালে আটকা পড়ে গেছে! এই দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠার সাথে সাথে আমরা আর একটা দৃশ্য পাই – হরিণটা তার মুক্তির জন্য লড়াই করছে। মানে দৃশ্যের অনেকগুলি স্তরে আমাদের টেনশন লুকিয়ে থাকে। যখন বুঝতে পারি যে লেখকের টেনশন জন্ম হয় একটা ধারণা থেকে তখন দেখি তার এই টেনশন আসছে একটা জিজ্ঞাসা থেকে। কী প্রকার জিজ্ঞাসা? আবার এই জিজ্ঞাসার আগে আসে একটি চিন্তা। আসলে চিন্তাটা শুরু হয়- একটা নিগেশন থেকে। ‘আছি’ নয় একটি ‘নাই’ ধারণা থেকে। যা শেষ পর্যন্ত ‘অচিন পাখিটা কেমনে পালায়’ থেকে বড় হতে থাকে। এক সময় দেখি লেখকের একটা সন্দেহপ্রবণ মনের জন্ম হয়– সে ভাবে পাখি পালিয়ে গেলে- খাঁচা ঠিকই থাকে, কিন্তু খাঁচা কাঁচা বাঁশের তৈরি হওয়ায় তারও স্থায়িত্বের কোনো নিশ্চয়তা নাই। তাই লেখকের টেনশন আরো দৃঢ় হতে থাকে। কারণ কাঁচা যে কোনো জিনিসই ভঙ্গুর আর অস্থায়ী। সেটি বাঁশ হোক বা বয়স।

পাখির ‘থাকার’ ধারণাটি থাকলেও- প্রশ্ন আসে- পাখি কিভাবে আসে আর কিভাবে যায়? আমরা বুঝতে পারি মানুষ প্রথম যেভাবে আত্মজ্ঞানে নিজের আয়নায় নিজেকে দেখে ও বোঝে সেখান থেকে সমস্যাটার শুরু। মানে আমি থাকলেও আসলে ‘আমি নাই’ এমন একটি অবস্থা থেকে প্রথম চিন্তার শুরু। পৃথিবীতে আসার পর মানব-সৃষ্ট বিবর্তনবাদ বা প্রকৃতিবিদ্যায় লাগাম নেয়ার আগে মানুষের চিন্তাযাত্রা হয়তো এরকম একটা হৃদয়বিদারক প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল। ‘আমি কী এবং যাবো কোথায়?’ সেই মোতাবেক ‘পাখি আসে আর যায়।’ যদি পুরো টেক্সটাকে একটা মেটাফর হিসাবে দেখি তাহলে– সে ভাবে খাঁচা মানে এই মানুষের ইহজীবনের বস্তুবাচকতা। তাই প্রশ্ন আসে- কে এটিকে- এই ধাঁধার খনি হিসাবে তৈরি করেছে? এই চিন্তা মানুষকে শুধু পাগলই করে ফেলে। কারণ প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই চিন্তাগত সীমাবদ্ধতার কারণে সে এই ‘খাঁচা’ নামক মেটাফরের কাছে এক সময় সে একটা আকারের সন্ধান পায়- শরীর বা দেহ নামে যাকে সে কল্পনা করে। যার ভেতরে মানুষ তার অস্তি-নাস্তির বীজ, মরা-বাঁচার দরোজা জানালাগুলিকে দেখে। বিশ্বাসী মানুষ এটিকে একজন সৃষ্টিকর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত কর্ম হিসাবে দেখে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখায় না। কিন্ত মানুষ

যখনই এই কর্মটিকে তার এই সমর্পণের অন্ধ ধারণা থেকে মুক্তি দিয়ে, তার নিজস্ব ভাবধারণার বশবর্তী করে এগোয়, তখন সে একটি দ্বিতীয় চিন্তা করার শক্তি অর্জন করে। আর সেই চিন্তাটা আসে তার নিজেকে দেখার বা আবিষ্কার করার একটি আত্মদর্শন লাভের সুযোগ থেকে। তার শুরুটা হয় এই বস্তুবাচকতা তথা এই দেহটাকে নিয়ে। তখন লালন আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। সে ভাবে, তার এই দেহের ভেতর কে থাকে? অচিন পাখি>সৃষ্টি না সষ্ট্রা>নাকি দুজনই? এই লেখকের দেখা তথাকথিত 'বিশেষ জ্ঞান' এর আওতায় দানা বাঁধেনি বলে তিনি দাবি করেন যে, শরীর একটা খাঁচা বা পিঞ্জর। তার ভেতরে 'অচিন পাখি' আসা-যাওয়া করে। সে ভাবে পাখি আসে কিন্তু থাকে না কেন? যায় কই। তাহলে তো একটি সমস্যাই। মানুষের চিন্তার সমস্যা। পাখির এই আসা যাওয়া একদিকে কিন্তু ধর্মীয় হায়াত-মউতের কথা মনে করিয়ে দেয়। একটা নির্দিষ্ট নিয়মের কথা মনে করিয়ে দেয়। মানে বোঝা যায় যে, লেখক এক সময় তার 'আত্মজ্ঞান' পেরিয়ে আল্লাহজ্ঞান দ্বারা তার জিজ্ঞাসাকে মজবুত করতে চাইছে। সে প্রথম মানবের মতোই বিস্ময়াভূত---এই অচিন পাখি কোথা থেকে আসে? শুধু শূন্য থেকে এলে তো শূন্যতেই মিলিয়ে যেত। কিন্তু তা নয়। তার একটি অচিন আধারবাটি আছে কোথাও– যেখানে সে পালিয়ে যায়! তার মানে সে কোথাও সব সময় থাকে। কোথাও 'হয়ে আছে' আর এক মহাজনের সৃষ্টিরূপে। কিন্ত তাকে তো আমি সৃষ্টি করতে পারি না। তাই তার ওপর আমাদের কোনো অধিকার নাই। পারি না বলেই একটা ক্ষোভ, জ্বালা তৈরি হয়। একটা টেনশন তৈরি হয়। আর থেকে থেকে একটা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়। কেমনে আসে যায়? এটি কি কোনো কেন্দ্রহীন স্বাধীন ভাবধারা? মানে এটি কি কোনো প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত আর পরীক্ষিত মহাজাগতিক চিন্তার বাইরে? মনে হয় বাইরেরই। মানে এটি কোনো তেমন সংস্কারস্নাত জ্ঞানধারা নয় মোটেই। সংস্কারস্নাত জ্ঞান হলে এই রকম একটা চিন্তাময় জিজ্ঞাসা একটি উত্তর পেয়ে শুরুতেই নষ্ট হয়ে যেত। কারণ এরকম জ্ঞান আস্তে আস্তে 'আছে ধর্ম' স্থায়ী হয়ে ব্যক্তির বিশেষ স্বাধীন অবস্থাকেই পরাধীনতায় পর্যবসিত করে। কিন্তু লেখক সেদিকে না গিয়ে ব্যক্তির বিশেষ চিন্তাধারার ওপর ভরসা রাখে। আত্মচক্ষু দিয়ে বুঝতে চায় পাখি কেন আসে যায় আর কেমনে পালায়?। কিন্তু ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত উত্তর পায় না বা উত্তর নেয় না। শুধু অচিন পাখির আগমন নিগর্মন দেখে। এই লীলাতেই সে আবদ্ধ থাকে, মজা পায়। যেমন একদিন ডেনমার্কের এক রাজপুত পেয়েছিল। বাবার হত্যাকারী আসে আর যায়! তার করার কিছু থাকে না। হ্যামলেট যেমন অসহায় তেমনি এই ফকির লালন। খালি প্রশ্ন করে আর নাটক করে বেড়ায়। টু বি অর নট টু বি? হবে কি হবে না? মানে- কেমনে আসে যায়? কোথায় থেকে সে আসে নয়, কোথায় যাবে সে নয়। কেমনে আসে যায়? এই আসা যাওয়ার 'খেল' টাই আসল। লাভ লোকশান কোনো বিষয় নয়।

তাহলে প্রশ্ন- কী আসে যায়? পাখিটি কী? তাকে কে পাঠায়? প্রাণ বলে যেভাবে আমরা ভাবি- তা তো নিশ্চয় নয়। যা থাকে সে তো আত্মা। প্রাণ দেহ আর মনের সম্মিলনের কারণে ঘটে। যা কিনা রক্তজাত। কিন্তু এই পাখি তা তো নয়। সে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরের একটি চিন্তাপাখি---

আত্মা। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়। আত্মা কী? তাকে কে দিয়েছে? এই প্রশ্ন এখানে নাই। নাই মানে যিনি দেয় তার চেয়ে বরং তার সৃষ্টি বা কিভাবে দেয় সে কথা কানে আসে। হয়ত পাখি নিজেই অধীশ্বর হয়ে আছে খাঁচাটির ভেতর। পাখি কী? সত্তা, সৃষ্টিকর্তা- এ যেন কপালের এক অদ্ভুত খেল।সহজে উত্তর পাওয়া যায় না। আমরা জিজ্ঞাসা আর উত্তর না পাওয়ার সমস্যায় আটকা পড়ে যাই। 'কপালের খেল' বলে লেখক কোন জিনিসের দিকে ইশারা দেন? এটি বলে তিনি কি আবার একটি প্রতিষ্ঠিতপ্যাকেজে পা রেখেছেন? মানে আসমানি কোনো ধর্মের দিকে? ধরে নেই যে তিনি তাই মনে করেন। কিন্তু এখানে আমরা একটা 'ফানা' কর্মেরই যেন ইশারা পাই। মানে সৃষ্টি আর সৃষ্টিকারীর কোনো আড়াল তিনি রাখতে চান না।

কবি জীবনানন্দের- আলো আঁধারিতে যাই, মাথার ভেতর কোনো বোধ কাজ করে- এই ভয়ংকর কাব্যভাবনা সর্ববিনাশী অসুস্থ সময়ের চিন্তাফসল হলেও তা শেষ পর্যন্ত লালন আইডিয়াজাতই। খাঁচা নামক এই পৃথিবীর ভালোবাসা, প্রেমে মগ্ন 'আমি'। আমার খাঁচায় ধরা এই রসভাণ্ড একদিন থাকবে না। মানে আবারো 'নাই'। তাই লালন কাঁদে। জীবনানন্দও কাঁদে। কেন? সে কী এই খাঁচার মায়ায় কাঁদে? নাকি পরম যে সত্তা যিনি এই অচিন পাখি সৃষ্টি করছেন তার সাথে মিলবে বলে তার সাময়িক আনন্দমাখা কান্না। কার জন্য সে অপেক্ষা করে? প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত প্রশ্নই থেকে যায়। লেখকের ব্যবহৃত ভাষা আমাদেরকে তার ব্যক্তিগত ভাষার চেইন থেকে তার জন্মঅধ্যুষিত জনমণ্ডলীর মুখের ভাষার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মানে মনের ভাষা। রাখঢাক নাই। তাকে শেকল দিয়ে পেঁচিয়ে আর একটি বিশেষ ভাষা বানানোর কোনো ইচ্ছা নাই। কেমনে, দিতাম, খেল, রইলি আশে ইত্যাদি শব্দচয়ন তার ও তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব যেমন করে তেমনি এই ভাষা হয়ে ওঠে এই রচনার রচনারীতির শক্তি। প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রায় জনবিচ্ছিন্ন পুস্তকীয় ভাষার বিরুদ্ধে কি এটি প্রথম ভাষাবিদ্রোহ?

মো: রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ raihan.khan01@northsouth.edu